মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে গড়িমসি

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন বিকালে দূর্বৃত্তদের হামলায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনার দেড় বছর অতিবাহিত হলেও ভাস্কর্যগুলো প্রতিস্থাপনে জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটি চাহিদা পাঠালেও এখনও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। এ ঘটনার পর থেকে মুজিবনগরে পর্যটকরা এসে হতাশায় ভুগছেন।

ভাস্কর্যগুলো মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ইতিহাস তুলে ধরতো পর্যটকদের কাছে। ভাস্কর্যগুলো ভাংচুর হয়েছে শুনে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের। তাঁরা এ দূর্বত্তায়ানের বিচার দাবি করেছেন। তবে এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট বিকাল থেকে রাত প্রায় ১০ টা পর্যন্ত দূর্বৃত্তরা দফায় দফায় এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ওই সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকার পতনের খবর ছড়িয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর থেকে প্রায় দুই শতাধিক র্দর্বৃত্ত রড, বাঁশ ও হাতুড়ি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলে। একই সময়ে এলোপাতাড়িভাবে আঘাত করে ‘১৭ এপ্রিলের গার্ড অব অনার’ ভাস্কর্যটিতে। আরও একটি দল ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের আত্মসমর্থনের ভাস্কর্যগুলোতে আঘাত করে। তবে সেখানে খুব বেশি ভাঙচুর করতে পারেনি তারা। পরে কমপ্লেক্সের মধ্যে দেশের মানচিত্রের আদলে তৈরি করা মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টরে যুদ্ধের বর্ণনা সংবলিত ছোট ভাস্কর্যগুলো ভেঙে আশপাশে ছুড়ে ফেলে। আরও একটি দল শহীদ স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটকটি ভেঙে নিয়ে যায়।

ওই সময়ে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্য সুমন আহমেদ বলেছিলেন, ‘তিন শতাধিক ছোট-বড় ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমরা প্রথমে তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তারা ভাস্কর্যগুলো ভাঙতে শুরু করে। এসময় আমাদের এক সদস্য পড়ে গিয়ে আহত হন। একদল এসে কিছূ ভাস্কর্য ভেঙে

চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার আর একদল এসে স্মৃতি কমপ্লেক্সের মানচিত্র ও গ্যালারির সকল ভাস্কর্য ভেঙে ফেলে। দূর্বৃত্তরা সীমনা রেলিং, স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটক, পানির পাম্পসহ বিভিন্ন মালামাল লুট করেও নিয়ে গেছে।’

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে স্থাপিত আনসার ক্যাম্পের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুবেদার রবিউল ইসলাম বলেন, ‘যখন দুর্বৃত্তরা এখানে হামলা শুরু করে, তখন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মুঠোফোনে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল। তিনি কোনো নির্দেশনা দিতে পারেননি। এ কারণে আনসার সদস্যরা নিজেদের জীবন ও অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যারাকে অবস্থান নেন।’

সম্প্রতি সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ভিতরে প্রবেশ করে মনে হলো যেন এক বিরানভূমি। দর্শনার্থীদের পদভারে মুখরিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটি আজ নির্বীকার হয়ে দাড়িয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে পর্যটন মোটেল, মসজিদ ও রাষ্ট্রীয় অতিথিদের বাংলো। এগুলো ভাংচুর করা হয়নি। এগুলো পেরিয়ে স্মৃতি কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্সের সামনে সারি সারি ভাস্কর্য। সেখানে সব ভাস্কর্য কমবেশি ভাঙচুর করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটির মাথা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাজউদ্দীন আহমদের ভাস্কর্যটিকে আঘাত করা হয়েছে। গার্ড অব অনারের ভাস্কর্যগুলোতে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়েছে। ভাস্কর্যগুলো ভেঙে পড়ে আছে। চেনার উপায় নেই সেগুলো। বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের আদলে তৈরি ছোট ভাস্কর্যগুলো একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কমপ্লেক্সের পেছনে জয় বাংলা তোরণের ‘জয় বাংলা’ লেখাটি খুলে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। তবে অক্ষত রয়েছে মসজিদ, এতিমখানা, বাংলোগুলো।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের লক্ষ্যে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান মুজিবনগরে) সমবেত হন। সেখানে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে ওই স্থান নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এম এ জি ওসমানীকে সরকারের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগরে তৎকালীন সাবডিভিশনাল পুলিশ

কর্মকর্তা মাহবুব উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রমের নেতৃত্বে ১২ জন আনসার সদস্য বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এই অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়।

পরে ১৯৮৭ সালে মুজিবনগর আম্রকাননে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিসৌধের। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ স্থানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে ১৯৯৬ সালে ওই স্থানে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তি আওয়ামী লীগ সরকার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সটিকে আন্তর্জাতিক মানের মুক্তিযুদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে ৪০৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ স্বেচ্ছাশ্রমে দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্ন করে আসছেন সুভাস মল্লিক। তিনি বলেন, মুজিবনগরের সৌন্দর্য সব শেষ হয়ে গেছে। আর ভালো লাগছে না। পর্যটকরা এসে আর কী দেখবেন?

মুজিবনগরে বেড়াতে যাওয়া স্কুল শিক্ষক ইয়ামিন হাসান বলেন, ‘রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু ইতিহাসের উপর আঘাত করা মোটেও কাম্য নয়। ইতিহাসের টানে বারবার মুজিবনগরে আসি। কিন্তু আগের সেই মুজিবনগর আর পাই না। বর্তমান সরকারের উচিত খুব্র দ্রুত সময়ের মধ্যে ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনেই মুজিবগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পুনর্গঠণ করা।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমেপ্লেক্সের একেকটি ভাস্কর্য স¦◌াধীনতার প্রতীক। যারা এগুলো ভেঙেছে তারা গর্হিত কাজ করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ ঘটনার শোনার পর থেকে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কাছে দাবি করি সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ভেঙে ফেলা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন করার দাবিও জানান তিনি।’

মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা মুজিবনগরে পরিদর্শন করে একটি চাহিদা পাঠাতে বলেছিলেন। তারপরই আমরা ভাস্কর্যগুলো নতুন করে প্রতিস্থাপন, অবকাঠামো ও ইলেকট্রিক কাজগুলো মেরামত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র পাঠানো

হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন প্রতি উত্তর আসেনি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা বলেন, ‘জেলা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্যের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে আমি যোগদান করার আগেই। তবে এখনো মন্ত্রণালয় থেকে কোন নির্দেশনা আসেনি।’

মুজিবনগর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য ভাংচুরের ঘটনায় থানায় কোন মামলা হয়নি।’

মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনলেন শুভসংঘের বন্ধুরা

মেহেরপুরে ৫৫ তম মহান স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গল্প শুনলেন শুভসংঘের সদস্যরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে মুক্তিযুদ্ধের স্মুতিচারণ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা (অব.) ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক।

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে কারণে ৩ বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। শুধুমাত্র একটি স্বাধীন দেশের জন্য আমরা মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাঁজি রেখে যুদ্ধ করেছি। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়।’

তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানীদের অস্ত্র ও ক্ষমতার কাছে আমাদের কিছুই ছিলনা। আমাদের ছিল অদম্য মনোবল আর কৌশল। তোমরা যারা তরুণ আছো দেশকে ভালোবাসো।’

আক্ষেপ করে তিনি বলেন, ‘মেহেরপুর জেলায় প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার

সংখ্যা কমবেশি ৩৫০ জন। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা এসে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়েছে। সেগুলো মিলে বর্তমানে ৬৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের কাছে দাবী জানাই , উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক।’

আলোচনা সভায় কালের কণ্ঠর মেহেরপুর প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, শুভসংঘের যুগ্ম সম্পাদক সাজিদ হোসেন, রাকিবুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম তুহিন, কোষাধাক্ষ ইয়াসির ইউসুব ইমন, সদস্য রাফি হাসান, কামরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম পাতা, লাওহে মাহফুজা ইশরা।

মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার আর নেই

মহান মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ, সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, বীর উত্তম আজ শনিবার সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

এ কে খন্দকারের জন্ম ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি।

পিতার তৎকালীন কর্মস্থল রংপুর শহরে। তার বাড়ি পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। তার পিতা খন্দকার আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং মাতা আরেফা খাতুন ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে এ কে খন্দকার ছিলেন তৃতীয়।

পিতার চাকুরির সুবাদে তার শিক্ষা জীবনের শুরু হয় বগুড়া শহরে। তিনি সেখানে বগুড়া করোনেশন স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। ভারত বিভাগের সময় এ কে খন্দকার ১৯৪৭ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে পিএএফ (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) থেকে তিনি তার কমিশন (পাইলট অফিসার পদ) লাভ করেন।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ফাইটার পাইলট হিসেবে কাজ করেন ও পরে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হয়ে ওঠেন। তিনি পাকিস্তান এয়ার ফোর্স একাডেমিতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর স্কুলে তিনি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন পিএএফ একাডেমি।

পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। ট্রেনিং উইং-এর অফিসার কমান্ডিং হিসেবে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি পিএএফ একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেন। পিএএফ প্ল্যানিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ১৯৬৯ সালের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পিএএফ বেইসের দায়িত্ব পান ঢাকায় ১৯৬৯ সালে।

এ কে খন্দকার উইং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় হলে তিনি মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হন। ২১শে নভেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি পদোন্নতি পান গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তর্বতী সরকার থেকে এবং জেনারেল এম এ জি. ওসমানী’র ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ বা উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবেও নিয়োগ পান।

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরে প্রধান অতিথি মনির হায়দার দু দলের ফুটবলারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়া ফুটবলে কিক দিয়ে খেলার উদ্বোধন।

মেহেরপুর জেলা মুক্তিযুদ্ধ সংসদের নতুন কমান্ডার শামসুল আলম সোনা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভায় মেহেরপুর জেলা ইউনিট কমান্ডের এডহক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নবগঠিত এই কমিটিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনাকে আহবায়ক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম মল্লিককে যুগ্ম আহবায়ক করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রায়হানুল কবীর।

কমিটির সদস্যরা হলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ছবেদার আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহাবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা গুরুদাস হালদার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিন উদ্দিন হালদার।

এডহক কমিটির অনুমোদনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক আহমেদ থান এবং আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়।

বেতাই না মুজিবনগর; কোনটা সঠিক?

একটি ছবি। কিন্তু দুটি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে ভিন্ন্ন স্থানের ক্যাপশন। দুটি ক্যাপশনই মুক্তিযুদ্ধের গৌরাবান্বিত ইতিহাস বহন করে। প্রশ্ন হচ্ছে, একই ছবি কিভাবে দুটি ইতিহাস তৈরি করে? আমাদের মত পাঠকদের মনেও হয়তো প্রশ্ন তৈরি হবে কোনটি সঠিক? বেতাই না কী মুজিবনগর।

মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের (সাবেক মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ) ‘ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন’ স্মারক সংখ্যা ও কলেজে অধ্যক্ষর কক্ষের ডিসপ্লে বোর্ডে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে। মাসুদ রেজা মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ভুগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

স্মারক সংখ্যার কোথাও মরহুম ছহিউদ্দিনকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার বা জড়িত থাকার তথ্য না থাকলেও সাবেক জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের বাণীতে মরহুম ছহিউদ্দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্মারক সংখ্যার একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের বেতাই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে পতাকা উত্তোলন করছেন ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম সেখানে পতাকাকে সালাম জানাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন। ওই একই ছবি মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে নোটিশ বোর্ডে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ অনুষ্ঠানের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ থেকে ২০২২ সালের মার্চ প্রকাশিত ইতিহাসের পাতা থেকে মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) নামের একটি স্মারক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা ও কলেজের অধ্যক্ষর কক্ষে ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন কর্ণার

[illegible] [illegible]


শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়

[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]



হয়েছে।

আবার এই ছবিটিই ক্যাপশন বদলিয়ে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের রুমে ডিসপ্লে বোর্ডে সাটানো হয়েছে।বোর্ডের একাংশে লেখা “ইতিহাস পরিক্রমায় ছহি উদ্দিন বিশ্বাস”। তার নিচে দেওয়া রয়েছে ৬টি ছবি। বোর্ডের অপরাংশে লেখা আছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী সংগঠক ও মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছহিউদ্দিন বিশ^◌াস এর জীবনতরী। বোর্ডে দেওয়া ছয়টি ছবির মধ্যে (বাম থেকে) দ্বিতীয় ছবিটি ক্যাপশন বদলানো সেই ছবি। ক্যাপশনে লেখা আছে “শপথ অনুষ্ঠানে প্রথম সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময়”। একই ছবি ভারতের বেতাই ক্যাম্পের আবার প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের। এটি পরিকল্পিত বিকিৃত বলে মনে করেছেন অনেকেই। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের ইতিহাস বিকৃতি সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরাও অনেকটাই অবাক হয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আযীমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আমি এই সংকলণ বা আমার রুমের ডিসপ্লে বোর্ডের ছবি বা লেখা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবো না। ৫২ পৃষ্ঠার সংকলনটির কোনো একটি স্থানেও আমার কোনো নাম নেই। এটি সম্পাদনা করেছেন, কলেজের সহকারী অধ্যাপক এম মাসুদ রেজা, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। আপনার কলেজের অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে আছে। তাদেরকে আপনি কোনটি ঠিক বলে উত্তর দেবেন এবং এটি ইতিহাস বিকৃতি কিনা এমন

[illegible] [illegible] [illegible]


ইতিহাস পরিক্রমায় ছহিউদ্দিন বিশ্বাস

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

তারা।

মুজিবনগরে ১৭ এপ্রিলের কোরআন তেলোয়াতকারী বাকের আলী বলেন, ৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের শপথ অনুষ্ঠানে মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। অথচ, একটি ছবির ক্যাপশন বদল করে তাকে উপস্থিত দেখানো ঠিক হয়নি। এটি ইতিহাস বিকৃতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আচরণ শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হবেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম বলেন, একটি স্মরণিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি কমিটি থাকতে হয়। অথচ, এই স্মরণিকাটি মাত্র একজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সেকারনে, মারাত্বক একটি অপরাধও সংগঠিত হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) এম এ মালেক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মো: নুরুল ইসলাম তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, জাতীর শ্রেষ্ট অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি একটি জঘন্য অপরাধ। সে যেই হোক ইতিহাস বিকৃতিকারির বিচার হওয়া উচিত।

তৎকালিন বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন মন্ডল (যিনি ১৭ এপ্রিলের আনুষ্ঠানিকতার প্রত্যক্ষ সংগঠক ছিলেন) বলেন, আমি অনেকবার বলেছি, মেহেরপুরের কোনো নেতাই সেদিন মুজিবনগরে উপস্থিত ছিলেন না। তারপরও যারা এধরনের ইতিহাসকে বিকৃত করে তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত নেতা মোমিন চৌধুরীর ভিডিও রেকর্ড মেহেরপুর প্রতিদিনের সংগ্রহে আছে। তিনিও মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেননি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ইতিহাস বিকৃতি খুবই লজ্জাজনক, শিক্ষার্থীরা এতে বিভ্রান্তি হবে। মরহুম ছহিউদ্দিন সাহেব ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরের অনুষ্ঠানে ছিলেন না (প্রিন্ট ভার্সনে ছাপাজনিত ভুলের কারণে ‘না’ শব্দটি বাদ গিয়েছে)। তাঁকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা করা মানে তাঁকেই খাটো করা হয়েছে।

তবে স্মারক সংখ্যার সম্পাদক ও মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজার সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে কথা বলার জন্য বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি এবং তিনি ফোন ব্যাকও করেননি।

শেখ কামালের গুন গুলোকে তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি বলেন, শহীদ শেখ কামালের গুন গুলোকে তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশ প্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে মানুষ ও দেশের সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী।

জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সকাল ১০ টার আয়োজিত এ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আরো বলেন শহীদ শেখ কামাল ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।একজন সাংস্কৃতি ও ক্রিড়া সংগঠক শেখ কামাল তরুণ বয়সে জিবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে রনাঙ্গণে যুদ্ধ করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান ছিল অসামান্য। সাংস্কৃতিক ও ক্রিড়াঙ্গণে তার ছিল পদচারনা। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন আবাহনী ক্লাব। তার বাজানো পিয়ানোর সুর বাড়িতে ঝংকার উঠতো।সে ছিল অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র। কথা বলতেন কম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী দোদুল আরো বলেন, শোকের মাস আগষ্ট, একটা সংগ্রাম ও চেতনার মাস। ৭৫ সালে এই নির্মম হত্যাকান্ড না ঘটলে বাঙ্গালী জাতির জন্য শেখ কামাল বিরাট অবদান রাখতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালী জাতীকে বিশ্বাস করতেন। ভালবাসতেন এদেশের প্রতিটি মানুষকে। তিনি কখনো বিশ্বাস করেননি যে, এই জাতী তাকে ও তার পরিবারকে হত্যা করবে।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডি) মৃধা মো: মুজাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, নাজমুল হুদা, আশরাফুজ্জামান ভূঁইয়া, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

মুুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই থেকে জামুকার তালিকা বহির্ভূত আবেদনকারীদের বাতিল করা হোক

জীবন বাজি রেখে যে সকল বীর সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, যাদের আত্মত্যাগের কারণে আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি। বিশ্বে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তারাই জাতির শেষ্ঠ্র সন্তান।

মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা কখনোই সনদ কিংবা সরকারি কোন সুবিধা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন না। দেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতেই তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে যখন দেশদ্রেীহী, রাজাকার, রাজাকারের সন্তানরা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য আবেদন করেন তখন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা তা মেনে নিতে পারেন না। তা নিরসন করার জন্য যখন তারা দাবি তোলে, তাদের সেই আর্তনাদ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও মাথাব্যাথা দেখা যায় না।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে ‘মেহেরপুরে

রাজাকার, রাজাকারের সন্তান যারা আবেদন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য (মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দাবিতে যেভাবে বলেছেন)। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি আমলে নিয়ে ওই সকল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

পরিশেষে, বর্তমান সরকার জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা, ভাতা বৃদ্ধি, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর নির্মাণ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা চালু করেছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জমি আছে ঘর নেই এমন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রায় সাড়ে ১৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে বীর নিবাস নামের বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছেন। যার কাজ চলমান রয়েছে।

যদি আজ ভুয়া, অমুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধা বনে যান, সরকারের এসকল সফল উদ্যোগ, ওই সকল লোভাতুর মানুষদেরকেই কেবল সুবিধা দেবে। বঞ্চিত হবে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিহীন কিশোর যোদ্ধা শহীদ হামিদ

একাত্তরের ডিসেম্বর মাস। মেহেরপুরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা। শীতের নীল কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে লালবাজার সাবসেক্টরের মুক্তিবাহিনী মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে সমবেত হতে থাকেন। পাক সেনাদের হটিয়ে দিতে তারা মেহেরপুর শহরের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছেন। মর্টার থেকে শেল নিক্ষেপের ফলে পাক সেনারা তখন ভীত সন্ত্রস্ত। মেহেরপুর শহরের পথে পথে মুক্তিকামী জনতা ও ছাত্র-তরুণরা গড়ে তুলেছেন ব্যারিকেড। শত্রুদের প্রতিরোধ ও পরাস্ত করে মেহেরপুর শহরকে মুক্ত করতে হবে, এই তাদের প্রতিজ্ঞা।

আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখছে, ‘মেহেরপুর শহর দখল নিয়ে জোর লড়াই চলছে।’ ব্যারিকেড গড়ে তোলার পিছনে যে সকল ছাত্র-যুবক-

তরুণঅক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন তাদের মধ্যে ক্রীড়া সংগঠক, ফুটবলার, সংস্কৃতিসেবী আবদুল হামিদ অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অগ্রজদের কাছ থেকে কাঁচা হাতে বন্দুক-রাইফেল চালানোর ট্রেণিং গ্রহণ করে পাকিস্তনি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লড়াইয়ে গোপনে সক্রিয় হন।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলিতে মেতে ওঠেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কিশোর-তরুণদের সংগঠিত করার কাজে। যে দুরন্ত কিশোর সারাদিন মেতে থাকেন খেলাধূলা নিয়ে, সেই তিনিই রাতের আঁধারে স্কুলের প্রাচীরে, বাড়ির দেয়ালে, দোকানে, চায়ের স্টলে পোস্টার সেঁটে দিতেন স্বাধীনতার পক্ষে। পোস্টারের স্লোগান গুলি কবিতা হয়ে মানুষের মুখে মুখে ফিরতো।কিশোর বয়সেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রীড়াঙ্গনে, ফুটবল মাঠে তিনি নেতৃত্ব দিতেন। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে নাটক মঞ্চায়ন, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনেও নেতৃত্ব দিতেন।

স্বাধীনতার পক্ষে জনমতগড়ে তোলার জন্য বন্ধুদের নিয়ে শহরের অলিগলিতে লিফলেট বিতরণ ও পোস্টারিং করতে একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন। একদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী রাজাকারদের মুখের ওপর দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘এদেশ একদিন স্বাধীন হবেই। রাইফেল বেয়োনেট দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্নগুলো হত্যা করা যাবে না।’ এ কারণে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বিহারী ও পাকসেনাদের চক্ষশূলে পরিণত হন।

অদম্য সাহসী, সংস্কৃতিসেবী ও ক্রীড়া সংগঠক আবদুল হামিদ তখন ছিলেন মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। চালাক, চটপটে, বুদ্ধিদীপ্ত আবদুল হামিদ লেখাপড়াতেও ভাল ছিলেন। বিপদে-আপদে ছুটে যেতে যেতেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। পাড়া-প্রতিবেশীরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বয়োস্বল্পতার কারণে স্বাধীনতাযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন।

সেদিন ছিল ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ। সকালটা ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু দুপুরটা রৌদ্র ঝলমলে। পোস্টারিং ও লিফলেট বিতরণ করে বাড়িতে দুপুরের আহারে বসেছেন আবদুল হামিদ। মা তাঁকে পাশে বসিয়ে খেতে দিয়েছেন, ছোট ভাই আবদুল লতিফ, আবদুল গণি, মনিরুল ইসলাম ও আবদুস সালাম উঠানে খেলাধূলায় মেতে আছেন। মা তাঁর পাতে মাছ, সবজি, ডাল তুলে দিচ্ছেন একে একে, মায়ের তখনও দুপুরের খাবার খাওয়া হননি।

হঠাৎশরীফ বিহারীর নেতৃত্বে রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মেহেরপুর শহরের গভর্নমেন্ট হাইস্কুল পাড়ার আব্দুর রশীদের বাড়িতে প্রবেশ করে। মায়ের সামনেই হামিদকে পিছমোড়া করে বেঁধে মেহেরপুর কলেজের পাকিস্তানি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে টানা তিন দিন নির্যাতন করে ৩ ডিসেম্বর রাতে তাঁকে মেহেরপুর কলেজ বধ্যভূমিতে গুলি করে হত্যা করে লাশটি মাটিচাপা দিয়ে পুঁতে রাখে।

শহীদ হামিদের মরদেহটি প্রথম শনাক্ত করেন মা হাদিসা বেগম। কাজী নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল প্রাঙ্গণের এক কোণে তাকে সমাহিত করা হয়। কবরটি আজও অবহেলায় অযত্নে পড়ে আছে। স্বাধীনতার পর ৫০ বছর পার হয়েছে, কিন্তু কবরটি আজও পাকাকরণ করা হয়নি।

শহীদ আবদুল হামিদের জন্ম ১৯৫৪ সালে মেহেরপুর শহরের গভর্নমেন্ট হাইস্কুল সংলগ্ন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা আবদুর রশীদ ব্যবসায়ী, মা হাদিসা বেগম গৃহিণী। বড় মামা মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব মাস্টার ছিলেন মহকুমা যুবলীগের সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, বাবা স্বাধীনতার পক্ষে বলিষ্ঠ কর্মী। ছয় ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। উজ্জ্বল শ্যামলা বর্ণের সুদর্শন এই তরুণ ছিলেন মেধাবী ও অদম্য সাহসী। ভালো ফুটবলার, অ্যাথলেট ও ব্যাডমিন্টনে পারদর্শী। তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুর উল্কা স্পোর্টিং ক্লাব।

আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত রফিকুর রশীদের ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: মেহেরপুর জেলা’, অন্বেষা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তোজাম্মেল আযমের ‘মুজিবনগর: যুদ্ধজয়ের উপাখ্যান’ বইয়ে শহীদ রফিকুল ইসলামকে দেশমাতৃকার সাহসী যোদ্ধা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের ‘মুক্তিসংগ্রামে মেহেরপুর’ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ড. হারুণ আর রশিদ সম্পাদিত ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ’ বইয়ে অন্তর্ভূক্ত আবদুল্লাহ আল আমিনের লেখা একটি নিবন্ধে শহীদ হামিদের বীরোচিত আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শহীদ হামিদের স্মৃতি রক্ষার্থে মেহেরপুর শহরের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় ‘শহীদ হামিদ সড়ক’। কিন্তু এই তরুণ যোদ্ধার কপালে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি জোটেনি ।

লেখক: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি শহীদ উজির আলী মালিথ্যার

একাত্তরের ১৫ আগস্ট। জমাট মেঘে ঢাকা আকাশ, মাঝে মধ্যে হালকা বৃষ্টি। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই গাংনী থানার সাহারবাটী গ্রামে নেমে আসে ঘুটঘুটে আঁধার। চারদিকে সুনসান নিরবতা। মুক্তিপাগল তরুণ-যুবকরা গ্রাম ছেড়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছেন। বাড়িতে একাই পায়চারি করছেন উজির আলি মালিথ্যা। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই বড় ছেলে আক্কাস আলির নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সাহারবাটী ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদ।

মেজ ছেলে আকরাম আলি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের শুরুতেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বেতাই ক্যাম্পের আশে পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। স্থানীয় রাজাকারদের হুমকি ও আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দেশত্যাগ করেননি। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাড়িতে অবস্থান করে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন। হঠাৎ একদিন রাত নয়টার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আল শামসরা উজির মালিথ্যার বাড়িটি ঘিরে ফেলে। হামলা চালায় বাড়ির পাশ-ঘরের দরজায়। সজোরে লাথি মেরে ভেঙে ফেলে সদর-দরজা। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে দরজা খুলে দেন অসমসাহসী উজির আলি। ঢুকেই স্ত্রী ও গৃহকর্মীর সামনে তাকে রাইফেলের বাট ও ছড়ি দিয়ে নির্দয়ভাবে পোটাতে থাকে পাক-হানাদার বাহিনীর জওয়ানরা। বেদম প্রহার ও উপর্যুপরি লাথির আঘাতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসা হয়। চোখ বেঁধে ট্রাকে তুলে ভাটপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৫ আগস্টের গভীর রাতে তাকে ও তার বন্ধু এমলাক হোসেনসহ ৬ জন বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে পাশে কাজলার পানিতে লাশ ভাসিয়ে দেয়। তাদের

লাশ আজও স্বজনরা খুঁজে পায়নি। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহির রচিত ‘মুক্তি সংগ্রামে মেহেরপুর’ (জানুয়ারি ২০১৬) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, ‘১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে গাংনী থানা শান্তি কমিটির বিশেষ বৈঠকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা বুদ্ধিজীবী এবং স্থানীয় এলিটদের নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তালিকা আগেই করা ছিল, তা কার্যকর করা হয় ১৫ আগস্ট থেকে।’

উজির আলির জন্ম ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার গোয়াস-রহমতপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। বাবা দিরাজতুল্লাহ ছিলেন সচ্ছ্বল কৃষক, মা সাবেরা বেগম গৃহিণী। দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে তাঁর পরিবার মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পেশা হিসেবে বেছে নেন ব্যবসা, চাষাবাদ ও জনসেবা। তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন সাহারবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

তিনি ছিলেন একাধারে মানবহিতৈষী সমাজসেবক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মী, এবং মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। কবিতা রচনা করতেন এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় নিজের ছেলে ও স্থানীয় তরুণদের সহযোগিতা প্রদান করতেন। পকিস্তান আমলে সামরিক শাসনের মধ্যেও তার সহযোগিতায় উদযাপিত হয়েছে পয়লা বৈশাখ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। সরাসরি রাজনৈতিক দলে যুক্ত না হয়েও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ষাটের দশকের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতাযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতির সূচনালগ্নে তার বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিভিন্ন গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার বাড়িটি ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান।

বড় ছেলে আক্কাস আলি ছিলেন গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। রফিকুর রশীদের লেখা ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুর জেলা’ (আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭) গ্রন্থে উজির আলি মালিথ্যাকে ‘মুক্তমনা ও সংস্কৃতিপ্রাণ’ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে রফিকুর রশীদ লিখেছেন, ‘সাহারবাটির আরো দুজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম হচ্ছে: এমলাক হোসেন এবং উজির মালিথ্যা। দুজনেই মুক্তপ্রাণ ও সংস্কৃতিপ্রাণ। নিজেদের ছেলেদের মানুষ করেছেন উদার নৈতিক পরিবেশে। নিজ এলাকার মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৫ আগস্ট গভীর রাতে তাদের হত্যা করা হয়।’ উজির আলি

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, মফস্বল বাসের কারণে এই প্রতিভাধর সাংস্কৃতিক সংগঠক ও প্রগতিশীল মানুষটি মেহেরপুর জেলার বাইরে খুব বেশি পরিচিত নন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার বীরোচিত আত্মত্যাগে স্মৃতি ও পৌরষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এ এলাকার মানুষের হৃদয়ে অক্ষয় ও অম্লান হয়ে আছে।

তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাবার দেওয়া ও অস্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থা করতেন। এলাকার যুবক তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে যেতে উৎসাহ প্রদান করতেন। কিন্তু তাঁর বীরোচিত অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি মেলেনি আজও। তবে রফিকুর রশীদের লেখা আগামী প্রকাশনীর ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: মেহেরপুর জেলা’ গ্রন্থে উজির আলিকে ‘গাংনী থানার স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগণ্য ব্যক্তি’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের ‘মুক্তিসংগ্রামে মেহেরপুর’ এবং মূর্ধন্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আবদুল্লাহ আল আমিনের ‘ভাটপাড়া নীলকুঠি ও উনিশ শতকের বাংলাদেশ’ গ্রন্থে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯) উজির আলিকে সমাজসেবী, বিদ্যোৎসাহী, সংস্কৃতিসেবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উজির আলি এবং একাত্তরের ১৫-আগস্টের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ভাটপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে, চলছে বধ্যভূমি সংরক্ষণের কাজ। শহীদ উজির আলির বড়ছেলে প্রয়াত আক্কাস আলি ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী ও বিদ্যোৎসাহী। শহীদ উজির আলীর তিন ছেলে ও এক মেয়ে বেঁচে আছেন। তারা সবাই শিক্ষিত, শিল্পানুরাগী ও প্রগতিশীল রাজনীতির সমর্থক।

মেজ ছেলে সমাজ সেবক ও ক্রীড়া সংগঠক আকরাম আলি বলেন, বাবা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। তার প্রেরণায় আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। উদার-অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ হিসেবে তিনি কোনোদিন কোন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমর্থন করেননি। আমার বড়ভাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ঠ সংগঠক। মতাদর্শগত কারণে স্থানীয় শান্তি কমিটির নেতা ও রাজাকাররা বাবার উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতক-দালালদের প্রত্যক্ষ মদতে পাক হানাদার বাহিনী বাবাকে হত্যা করে। তিনি দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন, এ জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি।

শহীদ উজির আলি মালিথ্যার বড়ছেলের ছেলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার খালেদুজ্জামান বলেন, আমাদের দাদা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু তার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি। শহীদ

হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দাবি করছি।

লেখক: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ।